তারিখ ..28.OCT..2015...
পৃষ্ঠা ..১৪... কলাম.....2......

কালের কণ্ঠ

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বিদ্যালয়ের দীর্ঘ সময়সূচি কি শিশু নির্যাতন নয়

বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিনিয়ত শিশুকে মানসিক, শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে এসেও শিশু মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। আমাদের দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিশু শিক্ষার্থীদের দীর্ঘক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকতে হয়। বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থানের বিষয়টি শিশুর মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। একজন শিশু একাধারে ছয়-সাত ঘণ্টা পাঠ গ্রহণে মানসিক ও শারীরিকভাবে সমর্থ কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কিন্তু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বেশির ভাগ শিশুকে (১০+) দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থান করতে হয়। অনেকের মতে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর পাঠ গ্রহণের সময়সূচি মানসিক নির্যাতনের অন্যতম কারণ। সাধারণত একজন শিশুকে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান করে পাঠ গ্রহণ করতে হয়। দীর্ঘ সময় শিশুর বিদ্যালয়ে থাকার বিষয়টি এক ধরনের শিশু নির্যাতনের শামিল।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই শিশুদের ওপর যেকোনো ব্যাপারে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগের কঠোর বিরোধিতা করেন। এমনকি শিশুকে কতটুকু ভয়মুক্ত রাখা যায় সে ব্যাপারে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেক দিন থেকেই প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হতে শিশুকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে হতো। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়টি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি শিশুর অধিকার সুনিশ্চিতকরণ ও শিশুর আনন্দময় জীবন যাপনের দিকে লক্ষ রাখতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দেন।

আমরা জানি, শিশুর মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এরই মধ্যে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শিশুদের আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদানের বিধান চালু রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য নাচ, গান, আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুদের ভয়ভীতির মাধ্যমে পাঠদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ সবকিছুই শিশুর মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ রেখে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। তবে এতসব ভালো উদ্যোগের গোড়ায় সমস্যা থাকলে তা কোনোভাবেই যথাযথ সুফল পাবে না। কারণ আমাদের দেশের শিশুকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে কোনো রকমে খেয়ে না খেয়ে বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকতে হয়। কিছু বিদ্যালয়ে দুই শিফটে পাঠদান ব্যবস্থা চালু থাকলেও বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে এক শিফটে দীর্ঘ সময় পাঠদান পদ্ধতি চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় পাঠদানে শিক্ষকরাও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। ফলে শিক্ষার্থীদের যত্নসহ পাঠদান ব্যাহত হয়। এতে শিশুদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে পাঠদানের গুণগত দিকটি নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই একটি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিশেষ করে দুপুরের পরে শিশুরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ে। গ্রাম পর্যায়ে বেশির ভাগ শিশুর বাড়ি বিদ্যালয় থেকে যথেষ্ট দূরে। তারা অনেক সময় দুপুরে না খেয়েই বিদ্যালয়ে থাকে। আবার অনেকেই বাধ্য হয়ে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে যায়।

আমরা মাঝে মাঝে গণমাধ্যমের কল্যাণে জানতে পারি বিদ্যালয়ে শিশুর অসুস্থ হয়ে যাওয়ার খবর। আর এর পেছনেও অন্যতম কারণ বিদ্যালয়ে শিশুর দীর্ঘক্ষণ অবস্থান। আমাদের সমাজের সত্যিকার বাস্তবতা হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা লেখাপড়া করে। উচ্চবিত্ত পরিবারের ৯৯ শতাংশ শিশু কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ে। ইদানীং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও কিন্ডারগার্টেনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এমনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান ভালো হওয়া সত্ত্বেও সময়সূচি ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের ভর্তি করা হয় না। অথচ দুপুরের পরে দেশের প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন, বিদেশি স্কুল কিংবা বেসরকারি পর্যায়ের শিশু স্কুলগুলো ছুটি হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের দীর্ঘ সময়সূচির কারণে শিক্ষকদের গুণগত মান ভালো থাকলেও অনেক পরিবার তাদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করায় না। অথচ বাস্তবতা হলো কিন্ডারগার্টেনে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিংবা যথেষ্ট মেধাবী শিক্ষক না থাকলেও সময়সূচিগত কারণে সেখানেই শিশুদের ভর্তি করানো হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে বেশির ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করা দুই বা ততোধিক শিক্ষক রয়েছেন; যদিও মেয়েদের ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাস আর পুরুষদের স্নাতক। তবু চাকরির বাজার প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় এমন চিত্র বর্তমানে খুব স্বাভাবিক আকার ধারণ করেছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের কোনোটিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের কৌশল ও সময়সূচি বাংলাদেশের মতো এত দীর্ঘ নয়। এমনকি বাংলাদেশেও প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য স্তরের সময়সূচি এত দীর্ঘ নয়। উল্লেখ্য, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কোনো পর্যায়েই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো দীর্ঘ সময় শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ করতে হয় না। এমনকি বিদেশি, বেসরকারি কিংবা স্বায়ত্তশাসিত পর্যায়ের প্রাথমিক স্তরের কোনো বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীকে সরকারি বিদ্যালয়ের মতো দীর্ঘ সময় থাকতে হয় না। তাহলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থানের যৌক্তিকতা কী? এ প্রশ্নের উত্তর পাঠকরাই খুঁজবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০+ বয়সের কচিকাঁচা শিশুদের জন্য সাড়ে ৯টা থেকে সোয়া ৪টা পর্যন্ত সময়সূচি নির্ধারণ করা আছে। প্রায়ই সচেতন মহল সোয়া ৪টা পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার প্রতিবাদ জানায়। অনুমান করা হয়, যাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি নির্ধারণ করেছেন, তাঁদের সন্তানদের কেউই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে না। কাজেই এ শিশুদের কষ্ট অনুভব তাঁদের করতে হয় না।

সচেতন মহলের অনেকেই মনে করেন সাড়ে ৯টা থেকে সোয়া ৪টা পর্যন্ত এই সময়টা শিক্ষক ও শিশু শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই অমানবিক। এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন কি না তা বিবেচনাযোগ্য। সময় এসেছে বিদ্যালয়ের সময়সূচি নিয়ে কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনার। ডিজিটাল যুগে এসে সনাতনী পদ্ধতির সময়সূচি ধরে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। কিন্ডারগার্টেনগুলো যদি ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত চলতে পারে, তাহলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি পরিবর্তনে বাধা কোথায়?

ইদানীং লক্ষ করা যায় মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে শিশুকে ভর্তির ক্ষেত্রে খুবই প্রতিযোগিতা। বেশির ভাগ সচেতন পরিবার শিশুকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে চায়। অথচ এর বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুকে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের কোনো মাথাব্যথাই নেই। বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্র শিশুদের পাঠদানের সময়সূচি নিয়ে যথেষ্ট সচেতন হলেও বাংলাদেশে এ বিষয়ে এখনো কোনো তৎপরতা লক্ষ করা যায় না। সংগত কারণেই সচেতন মহলের একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, সরকারি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যেখানে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি পাঠ গ্রহণ করতে হয় না, সেখানে কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের দীর্ঘ সময় পাঠ গ্রহণ করতে হয়? ওই সব শিশু কী এত বোঝা সহ্য করার মানসিক শক্তি বহন করে?

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com